Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-III, April 2022, Page No.39-46
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

চর জীবন কেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসে প্রান্তবর্গীয় জনসমাজের কথকতা

ড. রাণা কংস বনিক

Abstract:

'River centered' and 'Island centered' novels have an important place in Bengali literature. it can be noticed that many 'river-centered' and 'Island centered novels produced in Bengali which familiarize readers with the living conditions of people who live in around a river or an island. Island, in Island centered novels, are not merely patches of island, but they serve as important symbols that hint at the various aspects culture, social, political and economic of a particulars place. In this article we will try to show how the lowers class consciousness and their protesting voices have a found a place 'Island Central' Bengali novels 'Charkashem' and 'Elish maris Char' novels.

জীবনের রূপরেখার সঠিক বাস্তবায়ন হয় সাহিত্যের আঙ্গিনায়। যার মধ্যে থাকে জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয়-পরাজয়, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি। আর এই সবকিছু অভিঘাতের পেছনে সক্রিয় থাকে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবনা ও মনন। আর উপন্যাস হচ্ছে এমন এক দর্পণ যেখানে সামাজিক বোধ, ভাবাদর্শগত মূল্যবোধ ও মৃত প্রতিবিম্বের স্থানে জ্যান্ত জীবনকে দেখা যায়। উপন্যাস একটি বিশেষ কালপর্বকে নিয়ে যেমন স্বতন্ত্র আলোচনা করার সুযোগ করে দেয় ঠিক তেমনি সেই সমাজের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সমাজের অন্তর্বাস্তবতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও যেন বহন করে। অধ্যাপক ড. প্রিয়কান্ত নাথের দেওয়া উপন্যাসের সংজ্ঞাকে এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি –

"উপন্যাস বলতে আমরা বুঝি, লেখক-ন্যারেশেন চরিত্র ভাষা সবকিছুর মিলিত ঐকতান। সামাজিক মনন, দার্শনিক প্রজ্ঞা, চেতনার পরিশীলন, নান্দনিক মাত্রা এসবই উপন্যাসের অঙ্গ। অর্থাৎ সময় পরিসর ও ক্রিয়ার ঐক্য উপন্যাসে অপরিহার্য। এ সবের সংশ্লেষণে উপন্যাসে হয়ে ওঠে বহুস্বরিক। তাই উপন্যাস শুধু জীবনের কথা বলে না, বলে সময়ের কথাও। উপন্যাস শুধু স্বদেশের কথা বলে না, বলে। স্বকালের কথাও। উপন্যাস, যেমন চেতনার দিগন্ত বিস্তার- তেমনি একই সঙ্গে নিজেকে চিনে নেওয়ার শিল্পও বটে। সমাজের অন্তর্বাস্তবতাকে ব্যক্তি ও সমাজের নানা দ্বন্দ্বের সমাবেশ উত্থাপিত করেন ঔপন্যাসিক। ভাবাদর্শ এবং মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের কথাবস্তু চরিত্র, স্থানও বদলে যেতে থাকে। সমাজের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। দোলচলতা এবং তার গোপন ও প্রকাশ্য টানাপোড়েন উপস্থাপিত হয় উপন্যাসে। তাই উপন্যাস হচ্ছে জীবন শিল্প।" [১]

তাই বলা যায়, প্রত্যেক উপন্যাস একটি স্বতন্ত্র মানব সংসার, স্বতন্ত্র জীবনখণ্ড। নদীর স্রোতে বয়ে আসা পলিমাটি ও বালুকণা দ্বারা তৈরী হয় চর'। আর সেই 'চর'কে কেন্দ্র করে অতিবাহিত হওয়া জীবন এবং নানা অনুষঙ্গ ফুটে উঠেছে আমাদের আলোচ্য 'চরজীবন' কেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসে। চরজীবন কেন্দ্রিক

উপন্যাসের মূল্য উপজীব্য বিষয় 'চর' হলেও সেই চরে বসবাস করা জেলে-মাঝিদের, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, দরিদ্র-সংগ্রাম ও শোষণ-নির্যাতনের ছবি আমাদের অন্তর্মুলকে নাড়া দেয়। গ্রাম-বাংলার প্রাণবন্ত জীবনকে নিয়ে যে 'চর' কেন্দ্রিক উপন্যাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কালিন্দী' (১৯৪০), অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' (১৯৪৯), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপনিবেশ' (১৯৪৪-৪৬) আবদুল জব্বারের ইলিশ মারির চর' (১৯৬১) ও অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' (২০০৭) | বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' ও আবদুল জব্বারের 'ইলিশ মারির চর' উপন্যাসে কিভাবে প্রান্তিকায়িতজনেদের জীবন সংগ্রাম, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা উপন্যাসের বয়ানের অন্তরালে লুকিয়ে আছে তাই তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

প্রান্তিকায়িত' বলতে আমরা সাধারণত বুঝি, সমাজে যারা প্রান্তে বসবাস করে, যাদের জীবন চরমাকারের দুর্ভোগ ও দুর্দশায় পরিপূর্ণ; অশিক্ষা, অসংস্কৃত জীবনধারায় যারা অভ্যস্ত; যাদেরকে কখনও সমাজের কেন্দ্রে আসতে দেওয়া হয় না। এই অসাম্য ও অনৈতিকতার মূলেও রয়েছে উচ্চবর্গের মানুষ। আমরা যদি আরও একটু গভীরে গিয়ে এই শব্দবন্ধটির বিস্তৃতি খুঁজি তাহলে সমস্ত সম্পর্কের মধ্যেই এই প্রান্তিকায়িতকে দেখতে পাবো। কারণ সামাজিক অসাম্য সবস্তরেই রয়েছে। প্রান্তিক-জনেরা হলো সমাজের একটি বিশেষ অংশ, যারা সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত। তাই সভ্য সংস্কৃতি সদাই তাদেরকে এড়িয়ে চলতে চায়। ফলে প্রান্তিক বর্গের লোকেরা প্রগতি, প্রকৃত উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্বন্ধে অপরিচিত রয়ে গেছে।

বাংলা সাহিত্যে যে সকল লেখকের আর্বিভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অমরেন্দ্র ঘোষ (১৯০৭-১৯৬২) খানিকটা পৃথক ও ভিন্ন চিন্তার প্রতিনিধি। তাঁর সাহিত্যবোধ জীবন ভাবনা সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে জিজ্ঞাসা সবকিছুই বিধৃত রয়েছে 'জবানবন্দিতে। সমাজের উত্তাল পরিবেশে নির্মম দারিদ্রের বিপ্রতীপে দাড়িয়ে যে জীবনকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন, সেই জীবনকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। "চরকাশেম (১৯৪৯) অমরেন্দ্র ঘোষের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী' উপন্যাসে কালিন্দীর চর যেমন নিয়তির পটভূমি তৈরি করেছে, 'চরকাশেম' উপন্যাসে চরের অমোঘ পরিহাস যেন উপন্যাসটিকে একটি ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছে।

'চরকাশেম' উপন্যাসের পিছন মলাটে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, তারাশঙ্কর যেমন রাঢ় জীবনের রুক্ষ রক্ত মৃত্তিকার কথাকার অমরেন্দ্র তেমনি পূর্ব বাংলার সজল স্নিগ্ধ নরম মাটির। এ বাংলার বিস্তীর্ণ নদ-নদী তার জলাভূমি কৃষিক্ষেত্রের পটভূমিকায় সেখানকার মাঝি, মাল্লা কৃষিজীবি মানুষের জীবনধারণের দুঃখ দুর্দশা, আশা আকাঙ্ক্ষার এক ঘনিষ্ট আলেখ্য 'চরকাশেম'।

কথা-সাহিত্য যেহেতু নিছক কল্পমালার ফলশ্রুতি নয় বা নিছক বাস্তবের ইট, কাঠ, পাথরে ধ্বস্ত হয়ে যাওয়া পোড়া জমি নয়। তার মধ্যে আমরা উভয়েরই প্রছন্ন উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। তাই লেখকের রচনায় ফুটে ওঠে সামাজিক অভিজ্ঞতার আলোয় নতুন বাস্তব সমাজ। তা ঠিক একইভাবে অমরেন্দ্র ঘোষের সাহিত্য জীবনে উঠে এসেছে বাস্তব কঠিন মাটি থেকেই। এধারণার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে প্রখ্যাত সাহিত্যতাত্ত্বিক শিপ্রা সরকারের অনুপম বাচনে -

'সাহিত্য সমাজ বিছিন্ন বৃন্তলীন কোন কুসুম নয় এবং সাহিত্যিকও নন সমাজ বহির্ভূত অলৌকিক জগতের কোনও কল্প মানুষ। সমাজের সঙ্গে তার বন্ধন শাশ্বত এবং নির্মাণ করেন এক নতুন বাস্তবতা, যে বাস্তবতা সমাজ অভিজ্ঞতারই শৈল্পিক ব্যঞ্জনামাত্র। [২]

'চরকাশেম' উপন্যাসে হাসেমের ছেলে কাশেমের এই স্বপ্নের ভিতর লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের গড়ে ওঠা চর, যে চর কাশেমের নামে হবে চরকাশেম। যে চরে মানুষজন বসতি করবে, হাট বসবে, গঞ্জ গড়ে

উঠবে এই স্বপ্ন নিয়ে বিভোর থাকত উপন্যাসের নায়ক তথা প্রান্তিকায়িতজনের প্রতিনিধি কাশেম। অমরেন্দ্র ঘোষ যে বাংলা মাটিতে জন্মেছিলেন, সেই বাংলাতে হয়েছে সাতটি দুর্ভিক্ষ। সেই দুর্ভিক্ষের ফলে সাধারণ মানুষ তথা সমাজের অন্তেঃবাসীদের ওপর প্রভুশক্তির যে কি পরিণতি হয়েছিল তারই একটি বর্ণনা উপন্যাসে পাই হাসেমের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে -

'যে দুর্ভিক্ষ সচরাচর লেগেই আছে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে। কৃষকের বেকার জীবনের। এক পক্ষব্যাপী সুদীর্ঘ বর্ষা, তাতে ঝাপটা বাতাস। পদ্মায় জাল ধরা যায় না। জেলেরা সব বাড়ি বসে ঝিমায়। হাসেম তার মা মরা ছেলেকে রেখে এলো এক সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ির কর্তীর কাছে। এবং চেয়ে আনল আড়াইটা টাকা। সে বছর তো শোধ করতে কাশেম। মারা গেল তিলে তিলে অল্প খেয়ে। শেষের কটা দিন নাকি হাঁপিয়েছিল। তাই চৌকিদার তার জন্ম মৃত্যুর হাত-চিঠায় সঠিক সংবাদটাই লিখে নিয়ে গেল মৃত্যুর কারণ হাঁপানি।[৩]

এই আখ্যানে হাসেমের ন্যায় হাজার হাজার প্রান্তিকায়িত প্রতিনিধি, দুর্ভিক্ষের আড়ালে, প্রভুশক্তির করাল গ্রাস থেকে নিস্তার পায়নি।

নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া মানুষের জীবন মাত্রাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন ঔপন্যাসিক। তাই 'ভাত-মরা' প্রতিবেশিদের কথা বলেছেন। যারা সমাজে সদাই লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত শোষণজালে আবদ্ধ। তাই ঔপন্যাসিক জীবন হালদারের মুখ দিয়ে সমাজের আসল বাস্তবটি তুলে ধরেছেন। তাই জীবন হালদার দৃপ্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলেছিল -

> 'চিরকালই আপনারা আমাদের ঘেন্না করেন। রাগ করবেন না কর্তা, বড় যারা, সহজে তারা ছোটর দিকে ফিরাও চায়না। ক্যাবল প্রবোধ দিয়া রাখে।'[৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মন্বন্তরের ফলে সর্বনাশা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পুঁজিতে পুঁজিতে স্বার্থের সংঘাতে জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে বাড়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মনুষ্য সৃষ্ট মন্বন্তর। এই মনুষ্য সৃষ্ট মন্বন্তরে যারা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল বণিক ব্যবসায়ীরা। আর তাদের শোষণ জালে পিষ্ট হয়েছে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ, যার কথা পাই উপন্যাসে -

> "কতিপয় মানুষের দুর্নিবার লোভের মুখোস খসে পড়েছে। উদঘাটিত হয়েছে তার হিস্র পাশবিক রূপ। কে যেন জবাব দেয়, 'আমি যে এসেছি মন্বন্তর। দৈবের দুর্ভোগ নয় - মানুষের সৃষ্টি।" [৫]

উপন্যাসে আমরা দেখি কাশেম হুক্কা সেবন করত। কিন্তু দেখা যায় রসময় যে হাতে হুক্কা ধরে সেবন করত সে হুক্কা কাশেমকে ধরতে দেয় না। কাশেমকে একটি ভিন্ন হুক্কা এগিয়ে দেয়। তাই জীবন হালদার জীবন ও জগৎকে ভালোভাবে অনুধাবন করে কাশেম ও ফুলমনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন -

> "সব গরিবের হুক্কা এক করিতেই হইবে। তা না হইলে এমন একটা দিন আসছে যে তাদের টিইকা থাকাই দুস্কর হইবে।"[৬]

ঔপন্যাসিক, কাশেম, ফুলমন, অঞ্জুমান এদের জীবন বলতে দরিদ্রের সঙ্গে এদের সংগ্রামকেই বুঝিয়েছেন। সত্যই নিম্নবর্গের মানুষদের মূলত দরিদ্রের মধ্যেই জন্ম দরিদ্রের সঙ্গে এদের সহবাস। তাই অন্ত্যজ মানুষদের অবস্থা বিচারে বলা যায় তারা চিরকাল বঞ্চিত-নিপীড়িত এবং অধিকারহীন। তাদের ক্ষুধিত চিৎকার বিদীর্ণ করে গ্রামের শান্ত পরিবেশকে; তাই জীবন পিওন বলে চলে -

> "তারা এক হইয়া ফসল কিনতে আছে। ধান-চাউল-তেল তামাকের দাম বাড়াইতে আছে - শুইষা নিতে আছে হিন্দু-মুসলমান খরিদ্দার গো। ট্যাসকো বসায় সরকার, ভার বয় রসময় কাশেম। গাধার লাইগো তো বোঝা আর সেয়ানের লাইগো ক্যবল মজা।"[৭]

'চরকাশেম' উপন্যাসে নিম্নবর্গের জীবনযাত্রায় কোনও রাজনৈতিক সংঘাত ঘটতে তেমনটা দেখা যায় নি। এখানে আছে শুধু খেটে খাওয়া মানুষ আর দরিদ্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বোঝাপড়া। এরই মধ্যে কাশেম ও ফুলমন স্বপ্ন দেখে সুখ-দুঃখের নীড় রচনা করতে চায়, চলে হৃদয়ের আদান প্রদান। তাদের মধ্যেও জাগে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা, জীবন পিওনের মধ্য দিয়ে দেখা যায় নতুন মতবাদ, চিন্তাধারা ও নব চেতনার ইঙ্গিত। বহু অন্যায়ের প্রতিবাদ, প্রতিকারের আশায় সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে জীবন পিওনের হাতে হাত রেখে উঠে দাঁড়াবার অঙ্গীকার শোনা যায়। তাই জীবন পিওন বলে -

> "প্রতিকার না হলে প্রতিবাদ করতে হবে অন্যায়ের। মাথা পেতে সইলেই অন্যায়। আরও উদ্ধত হয়ে ঘা মারবে।" [৮]

বাংলা সাহিত্যের ধারায় প্রতিনিয়ত দেখা যায় নিম্নবর্গের ওপর শোষণ, এ কোন নতুন ছবি নয়। এই উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়, হাসেম, কাশেম, অঞ্জুমান, ফুলমন তাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে কিন্তু। লক্ষণীয় বিষয় তাদের মধ্যে আবার প্রতিবাদের সুরও শোনা গেছে যখন অঞ্জুমান বলে সেই দরিদ্র পীড়িত সংসার থেকে -

> "তিন তিনটা ছেলেমেয়ে এসে তাকে কুকুরের বাচ্চার মতো ঘিরে ধরে। এতগুলো। লোকের মধ্যে টেনে তার দুধ বার করতে চায়। সেটাকে সে ঠেলা মেরে উঠানে ফেলে দেয়। জীবন-মরণ সমস্যার আলোচনা - এ সময় কি আর ভালো লাগে ছেলে মেয়েদের আব্দার। সাতরোজ-চোদ্দটা ওক্তো, লাগবে মাত্তর একটা টাকার চাউল। তাও যদি মরদার যোগাড় করতে না পারে তবে সোংসার পাতা ক্যান। মাগীগো গায়ের গন্ধ না হইলে বুঝি ঘুম আয়না।" [৯]

এ যেমন অঞ্জুমানের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ঠিক তেমনি অন্তেঃবাসীদের প্রাত্যহিক দিনলিপির একটি বাস্তব চিত্র। কিন্তু যা আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য করে তা হল জীবন পিওনের মুখ দিয়ে বেঁচে থাকার কথা। কবি শঙ্খ ঘোষ যেমন বলেছিলেন। 'পাগল হতে চাই না আমরা বেঁচে থাকতে চাই'। ঠিক তেমনি ঔপন্যাসিক উপন্যাসের যবনিকা টানেন এভাবে -

> 'দূর নদীবক্ষ থেকে একটা প্রতিধ্বনি ভেসে আসে - যেতে হবে, যেতে হবে। একটা কঙ্কালকেও আজ আশা বুকে নিয়ে মাথা খাড়া করে প্রতিবাদ করতে যেতে হবে। [১০]

তাই 'চরকাশেম' আখ্যানের অন্তরালে যে সময় পরিসর বিধৃত, প্রান্তিকায়িতজনের অন্তর্জীবন লুকিয়ে আছে তা সহজেই ধরা পড়ে। কারণ এই চরের মধ্য দিয়ে সেই সময়ের নিম্নবর্গীয় সমাজের অসহায় সংকটের কথা লুকিয়ে আছে তা বোঝাতে চেয়েছেন। তাই ঔপন্যাসিক নিজ অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে 'চরকাশেম' উপন্যাসে নিম্নবর্গ জীবনের যথার্থ নতুন মোড় ফেরার শিল্পরূপ এঁকেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যের লেখক আবদুল জব্বার তাঁর লেখন শৈলীর নিপুণতায় যে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা সমকালীন লেখক গোষ্ঠি থেকে স্বতন্ত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মত তার রচনাভাণ্ডার এত সমৃদ্ধ না থাকা সত্ত্বেও পাঠক হৃদয়ে যে স্থান অধিকার করেছেন তা প্রশংসনীয়। ইলিশ মারির চর' (১৯৬১) স্বর ও প্রতিস্বরের আততিতে গড়ে ওঠা একটি শ্রেষ্ঠ জীবনালেখ্য। চর' কেন্দ্রিক উপন্যাসে দেখা যায়, উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে আবহমান কাল ধরে যারা

অন্তেঃবাসী ও ব্রাত্য; অল্প সহজ করে বললে এভাবে বলা যায়, প্রান্তিকজনেরা। তাদের মতাদর্শ ও প্রতিবেদন সহ সমস্ত স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা যেন নির্বাসিত হয়ে থাকে। ইলিশ মারির চরে বসবাস করা প্রান্তিকায়িত জনেদের ভাগ্য বিড়ম্বনার নিয়ন্তা মহাজন, অশিক্ষা ও কুসংস্কারই ছিল তাতে কোন দ্বিমত নেই।

'ইলিশ মারির চর' উপন্যাসটি শুধুমাত্র কল্পনা - সিঞ্চিত নির্মাণ কলার প্রদর্শনী নয়। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে বহুমাত্রিক সত্য যা শিল্পীত বাস্তবের বহুস্বরের কথা বলে। তাই দেখি, ইলিশ মারির চরে বসবাস করা জেলে মাঝিদের আছড়ে পড়া জীবনের কথা বুঝাতে গিয়েই উপন্যাসের সূচনা করেছেন এভাবে –

"আষাঢ়ের অমাবস্যার গভীর রাতে ভরা কোটালের মুখেই নামলো আকাশ।" [১১]

ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে 'আষাঢ়ের অমাবস্যার গভীর রাতের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ ইলিশ মারির চরে বসবাস করা জেলে মাঝিদের ভবিষ্যৎ অমাবস্যার মত অন্ধকার। তাদের জীবন অশিক্ষা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আমরা জানি উপন্যাসে প্রতিফলিত প্রতিবেদন তা শুধুমাত্র ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতার বিবরণ মাত্র নয়, তার অন্তরালে লুকিয়ে আছে প্রচ্ছন্ন ভাষ্যের উপস্থাপনা। তাই চরে বসবাস করা জেলেমাঝিদের জীবনে যে লোক বিশ্বাস-লোকাচার তাদের কেন্দ্রে ছিল তার কথাই স্পষ্ট করার জন্য ঔপন্যাসিক তার লেখনীর মুন্সীয়ানায় বলেছেন -

> "এ ভাঙা চরের মাঝখানে আছে পাঁচটি খেজুর গাছ ঘেরা সবুজ ঘাসওয়ালা একখণ্ড জমি। গ্রীষ্ম, বর্ষা সারা বছরই সেখানে বসে থাকে কোনী - আটা প্রায় উলঙ্গ এক মেড়য়া সন্নাসী মরার মাংস খায়। শ্মশানটা ভেঙে না পড়াই যে তার মাহাত্মের প্রকাশ তা সবাই জানে বলেই সন্ন্যাসীর পোয়াবারো। ফলমূলটা আর গাঁজাটা জোটে তার।" [১২]

কিন্তু উপন্যাস যত এগিয়েছে সেই চরে বসবাস করা জেলে মাঝিদের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসেও আঘাত লেগেছে। কারণ সমাজ যাদের ব্রাত্য করে রেখেছিল, যাদেরকে দশের সম্মুখে আসার অধিকার দেয়নি, যাদের অন্দরমহলে শিক্ষার আলো প্রবেশ করার সুযোগ পায়নি তাদের জীবনে নব শিক্ষার, নবচেতনার দিশারী রূপে আবির্ভূত হয়েছিল তারিণী মাঝির ছেলে রতন। তার প্রচেষ্টায় প্রান্তিকায়িত জেলেমাঝিরা বেঁচে থাকার মন্ত্র শিখেছিল। রতন প্রগতিবাদের প্রতীক। তাই তার একাগ্রতা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন স্বরূপ দেখতে পাই ইলিশমারির চরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। শিক্ষা যখন সমাজের তৃণস্তরে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল তখন সাধুর অস্তিত্বের সংকট সহসা ভেসে আসে আমাদের সামনে -

> "যেখানটাতে মেড়য়া সন্ন্যাসীটা রাতদিন বসে থাকতো ধুনি জ্বেলে। বড় একটা ভয়ংকর ফাটল অনেক দূর থেকে কুম্ভকর্ণের মতো গাল মেলেছে হাঁ করে।" [১৩]

এই 'ভয়ঙ্কর ফাটল' শুধুমাত্র জমির ফাটল নয়। এই ফাটল' হচ্ছে এতদিনকার বহন করা ঐতিহ্য; চেতনা, মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শের ফাটল। এই ফাটল' যে যুগ পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে তা আমাদের আর বোঝার অপেক্ষা রাখে না।

ইলিশ মারির চরে ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ ছিলেন তারিণী মাঝি ও তরবদি মাঝি। দু'জন দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের। একজন হিন্দু ও অপরজন মুসলমান। তারা তাদের মতানুসারে 'বখরা' তৈরি করে 'বখরা' আদায় করতো। এই বখরা আদায়ের মধ্যেও ছিল মহাজনদের স্বার্থপর দৃষ্টি ও শোষণের চূড়ান্ত মাত্রা। একথা ঔপন্যাসিক এভাবে উল্লেখ করেছেন -

> "চারটে মাছ পাও মহাজনের আড়াইটা, বাকিটা হবে সাড়ে তিন বখরা; দু'জন দাড়ির । দু'বখরা, একজন মাঝির দেড় বখরা। মহাজনের হাত দিয়েই হবে সে ভাগ বাটোয়ারা।" [১৪]

জেলে মাঝিদের শরীর ভালো না লাগলেও তাদের মাছ ধরতে যেতে হয়, নয়তো তাদের খাওয়া। জুটবে না। সারারাত মাছ ধরে; রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঠাণ্ডা কোন কিছুতেই কাহিল হয় না তারা। কারণ তারা জানে যে উপযুক্ত জাল বা নৌকা তাদের কাছে নেই; আর ইলিশের মরসুমে যদি ঠিকঠাক মাছ ধরতে না পারে তাহলে তাদের সংসার নির্বাহ দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। তারপর তাদের জালে যদি কাজল-গৌরী ইলিশ মাছ ওঠে তাহলে সে মাছ তারা বিক্রি না করে মহাজনদের ঘরে দিয়ে আসে। তাই জেলে মাঝিদের আক্ষেপের সুরকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন এভাবে -

"তাকে দিতে হয় সবকিছু। মাছ, টাকা, মান, ইজ্জৎ, সায় জীবন পর্যন্ত।" [১৫]

ঔপন্যাসিক তরবদি মাঝির মধ্য দিয়ে সেই সমাজের স্বার্থান্বেষী, লাম্পট্য ও কুচক্রী মানুষ কিভাবে তাদের অর্থের দাপটে সাধারণ মানুষ থেকে মহাজন হয়ে ওঠেছে তার কথাই বলেছেন। তার চারিত্রিক ত্রুটি সেই চরে বসবাস করা প্রত্যেকটি নর-নারীদের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। তার পাশবিক অত্যাচারের বলি হয়েছিল কানাইের বৌ মালতী, মেয়ে লক্ষ্মী ও হরেনের স্ত্রী সিন্ধু। মালতীর মধ্যে আমরা তরবদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আগুন জ্বলতে দেখি। সে এধরণের অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল।

তাই সে তরবদির মতো মহাজনকে সেই চর থেকে উচ্ছেদ করার জন্য মালতী প্রাণনাশ করার হুকুম দিয়েছিল। আর মালতী তরবদির প্রাণ নাশ করতেই হবে সে কথা জোড় গলায় বলেছিল -

> "ওর জন্যে সবাই গেল। তোর বাপ, গুলে, কেলো হরেনের বৌ আর হরেনও যেতে বসেচে পেরায়, তারপর তুই তোর পেটের ছেলে সবগেল সব যাবে। মা হয়ে তকে বলচি, তুই। ওকে মার; পাপ হবেনে, স্বগ্যে যাবি, পুন্যি হবে। তুই মেয়ে; তোকে আর সব কথা আমার খুলে কি বলবো, ও হলো পাপী দুর্যোধন; ওর ওই রকম মরনই ভাল।" [১৬]

কানাইের স্ত্রী লক্ষ্মীকে ঔপন্যাসিক ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। তার মধ্যে সমাজবোধ প্রবল। পরিমাণে গ্রথিত ছিল। তাই তো মালতীর বিয়ের জন্য যখন বয়স্ক ছেলের আলাপ আসল তখন সঙ্গে সঙ্গে এই বিয়েতে অমত পোষণ করে। উপন্যাসের শেষাংশে তরবদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। প্রান্তিকায়িত জনেদের অসাম্য ও অনৈতিকতা প্রতিনিয়ত সইতে হতো। কারণ তাদের শিক্ষা-দীক্ষার অভাব ছিল, অর্থের অভাব ছিল, জীবিকা সংস্থানের জন্যও অন্যের ওপর নির্ভর করতে হতো। তাই মালতী তার প্রাপ্য অধিকারটুকু প্রাপ্ত করার জন্য যখন তরবদি কাছে গিয়েছিল তখন তরবদি মহাজনের কণ্ঠে আধিপত্য বর্গের ধ্বনিই প্রতিফলিত হয়েছে -

> "ভাগ কেটে পড় এখান থেকে। তোর বাপ রোজগার' 'মাত্তা বসিয়ে রেখে গ্যাচে বোধ হয় এখেনে?" [১৭]

তরবদি মাঝির মধ্যে ঔপন্যাসিক পিতৃতন্ত্রের আদলকে নিহিত করেছেন। আমরা জানি, পিতৃতন্ত্রের কাছে নারীরা সদাই প্রান্তিকায়িত; নারীদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর নেই বলে তারা দাবী করে; তাই তারা লাঞ্ছিত, প্রতারিত ও অবহেলিত। তরবদি মাঝি নিজের কুকর্ম ঢাকার জন্য স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করতেও তার বিবেক শাসন করেনা। তরবদি মাঝির স্ত্রী কুলসম যখন স্বামীর আসল চেহারা সম্পর্কে অবগত হয় তখন সে স্বামীর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে বলে -

> "যেত বুড়ো হোচ্চ তেত বুড়ো ভাম হোচ্চ তুমি? ছেরকাল একরকম! ... কপাল ঠুকে ঠুকে 'নিমাজ পড়ে কপালে দাগ করে ফেলেচে আর পরের মাগের দোরে যেয়ে কাপড় বেলাউজ দিয়ে আসে কেন ?" [১৮]

এসব কথা শুনে তরবদি মাঝি পশুর মত গর্জে ওঠে স্ত্রীর ওপর পাশবিক অত্যাচার করে। তার কথাই লেখক বলেছেন এভাবে -

> "কুলসমের টাটিটা টিপে ধরে চাপা কর্কশ স্বরে পশুর মত গর্জে ওঠে, সাবার করে দোর হারামজাদী মাগী! চুপ কর ! করবি চুপ ? আমি যাই করি তোর বাবার কি ?" [১৯]

লেখক আব্দুল জব্বার কুলসমের মধ্য দিয়ে প্রান্তিকায়িত নারীর অবদমিত কণ্ঠস্বর সোচ্চার ভাবে প্রকাশ করেছেন। তাদেরও যে নিজের মত আছে, নিজস্ব অভিমত আছে, প্রতিবাদের ক্ষমতা আছে তারই নমুনা কুলসমের উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে -

> "চুপ করবো? কি অন্যায় করিচি? পথেও হাগবে ও চোখও রাঙাবে? বাপতুলে কথা বলতে লজ্জা পায়নে?" [২০]

অন্যদিকে তারিণীমাঝির মধ্যে দেখা যায় স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও সন্তানদের প্রতি প্রবল স্নেহানুরাগ। সেও তরবদি মাঝির মতো বখরা আদায় করতো কিন্তু তার ছেলে রতনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মাঝিদের থেকে বখরা নেওয়ার নমুনাও পাল্টে গেছে। মহাজনেরা যে কিভাবে প্রান্তিকায়িত জেলেমাঝিদের ঠকিয়ে তাদের ধনভাণ্ডার সঞ্চিত করেছে ও শোষণ করেছে তার প্রতি সবাইকে ওয়াকিবহাল করায়। তরবদি মাঝির কুশাসন ও শোষণের জন্যই হরেন ও তার স্ত্রীর সিন্ধুর জীবন অকালেই গাঙের জলে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু জয়নুদ্দির ভূমিকা উপন্যাসে অপরিসীম। সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে সে প্রান্তিকায়িত বর্গের প্রতিনিধিত্ব করে। জয়নুদ্দি জলের অনিশ্চয়তা ছেড়ে রতনের সাহায্যে নিশ্চয়তার জমির বন্দোবস্ত করার কথা ভাবে। কিন্তু তার মধ্যেও লোকবিশ্বাস ও সংস্কার প্রবল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় তাই সে নতুন জাল নিয়ে যখন নদীর বুকে পাড়ি দেয় তখন সে পাঁচ পীরের বদরগাজীর কাছে বাতাসা মানত করে। কিন্তু রতন যখন আগ্রহ ভরে সমাজের অনিয়মের প্রতি তাকে সচেতন করে তুলে তখন সে নতুন যুগের মানুষরূপে সেই নিম্নবর্গীয় প্রান্তিকায়িত জনসমাজে আবির্ভূত হয়। ফলে রতনের দেখানো নতুন বখরার হিসেব প্রত্যেক জেলে মাঝিদের ওয়াকিবহাল করে মহাজনদের বিরুদ্ধে জয়নুদ্দি প্রতিবাদ করে।

'ইলিশ মারির চর' উপন্যাসের লেখক পূর্বপরিকল্পিত ধ্যান ধারণার নিয়েই রতনের মত চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। রতন নায্য আইনের কথা বলে; নায্য আইন সমাজের মধ্যে সমতা তৈরি করে। রতন সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া উচ্চ শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষম্য চিরকালের জন্য দূর করতে চেয়েছিল। ঔপন্যাসিকের নিজস্ব অভিব্যক্তিই রতনের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন। জয়নুদ্দির ছেলের নাম কী রাখবে তা নিয়ে যখন অনেক কথা হয়েছিল তখন রতনের উক্তিতে জগতের পরম সত্যই প্রকাশিত হয়েছিল -

> "যে সৎলোক; পুন্যাত্মা, সে যে জাতেরই যে ধর্মেরই হোক তার জন্য পুরস্কার আছে। থাকাও উচিত। ... তবে অবশ্য তোমার বিবেককে জাগ্রত করতে হবে – জ্ঞানী করতে হবে। - তার জন্য শিক্ষার দরকার।" [২১]

ঔপন্যাসিক জীবনের প্রতিটি সত্যকে স্বীকার করেই নিজ অভিব্যক্তি এই কথন বয়নে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমাদের জ্ঞানের পরিসরকে বড় করে তুলতে হলে লেখাপড়া করতেই হবে। লেখা-পড়া করাই যে চাকরি পাওয়া বা চাকরি পেতেই হবে এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণার বিরোধিতা করে ঔপন্যাসিক বলেন -

> "মুচিরও লেখাপড়া শেখা দরকার। লেখাপড়া শিখে যে চাকরিই করতে হবে তা কি কোন মানে আছে? শিক্ষা হলো আলো, নিজের অন্তরের অন্ধকার ঘোচাবার জন্যে নিজের প্রাণের জগৎকে আলোকিত করবার জন্য।" [২২]

তাই উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে হৃদয়কে বিশ্বদেউল করে গড়ে তুলবার জন্য রতন সবাইকে আহ্বান করে। আর এই শিক্ষাই পারে সমাজের সবধরণের অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। উচ্চবিত্তরা কখনও নিম্নবিত্তের ওপর অত্যাচার করবেনা, প্রান্তিকায়িতরাও নিজেদের নিজস্ব স্বর ও অবস্থান খুঁজে পাবে।

তাই শেষে বলা যায়, 'চরকাশেম ও ইলিশ মারির চর' উপন্যাসে দুটি ঔপন্যাসিকদের অভিজ্ঞতার পরিপক্কতায় জীবনকে পূর্ণ প্রসারে দেখার এক স্বতস্ফূর্ত প্রয়াস। আলোচ্য উপন্যাস দু'টিতে প্রান্তবর্গীয় জনসমাজের বেঁচে থাকার গান ও তাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে উত্তরণের পথও নিহিত হয়েছে।

আকর গ্রন্থ:

১. ঘোষ অমরেন্দ্র, চরকাশেম', সারস্বত লাইব্রেরী কলকাতা - ৬, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৬।

২. জব্বার আব্দুল, 'ইলিশ মারির চর', ইউনিভার্সল বুক ডিপো কলকাতা - ১২, প্রথম প্রকাশ - ১৩৬৮।

উল্লেখ সূত্র -

১. নাথ ড. প্রিয়কান্ত, কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ - ২০০৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৩।

২. সরকার শিপ্রা, সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য', বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯।

৩. ঘোষ অমরেন্দ্র, 'চরকাশেম', সারস্বত লাইব্রেরী কলকাতা - ৬, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩ সংখ্যা - ৩৯।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১১৬।

৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪৪।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪৫।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৩৪।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯।

১০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৩৪।

১১. জব্বার আব্দুল, ইলিশ মারির চর', ইউনিভার্সল বুক ডিপো কলকাতা - ১২, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৮ পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১।

১২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৬।

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৭।

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩।

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪।

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২০১-২০২।

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২০২।

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪৯।

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪৯।

২০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫০।

২১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩২।

২২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১০৭।